দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 3 0 DEC 1998
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১

ভর্তিযুদ্ধ

ইংরেজী নতুন বছর শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সারা দেশে বিশেষ করে রাজধানীতে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে একটা যুদ্ধই চলে। এ যুদ্ধ সবচাইতে তীব্র রাজধানীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয়, বিশেষ করে নামীদামী স্কুলগুলোতেই। অভিভাবকদের আহার-নিদ্রা ছুটে যায় এ সময়টাতে একটি নামীদামী স্কুলে ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করানোর জন্য। জীবন যুদ্ধে পর্যুদস্ত সীমিত আয়ের মানুষকে এ সময় বাড়তি ঝামেলা ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ফি বছরই এবং এর আর কোন কিনারা হচ্ছে না। প্রাথমিকসহ সরকারী বা বেসরকারী কোনরকম বিদ্যালয়েরই সংখ্যা বাড়ছে না, বাড়ছে না ছাত্র ভর্তির আসন সংখ্যাও। ফলে ভর্তি সঙ্কটের কোনরকম হেরফের হচ্ছে না।

গত শনিবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে রাজধানীতে এই ভর্তি সঙ্কটের সর্ব সাম্প্রতিক যে চেহারাটা তুলে ধরা হয়েছে, তা আগের মতোই। মোটেই তা সুখকর নয়। সেই একই হয়রানি এবং ভোগান্তি চলছে অভিভাবকদের ছাত্র ভর্তি নিয়ে। আর কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হচ্ছে নিদারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। লেখাপড়াটা যে শিশুর কাছে এখনও নিছক খেলার মতো, সদ্য খেলনা হাতে নিয়েই যে কিনা 'অ আ ক খ', কিংবা 'এ বি সি ডি'র পাঠ নিতে শুরু করেছে, সেই প্রথম শ্রেণী কিংবা সমস্তরের ক্লাসে ভর্তি হওয়ার যোগ্য শিশুটির চারপাশে স্তূপীকৃত হয়ে আছে এখন ভর্তি হওয়ার 'গাইড বই'। নির্বিঘ্নে তাকে ভর্তির বৈতরণী পার করানোর জন্য রাখা হয়েছে প্রাইভেট টিউটর। জীবনের একেবারে উষালগ্নেই শুরু হয়েছে তার লেখাপড়ার ক্ষেত্রে 'স্পুন ফিডিং' অর্থাৎ লেখাপড়াটাও চামচে করে গিলিয়ে দেয়া। পরনির্ভরশীলতার পাঠ নিচ্ছে সে শুরু থেকেই। অনেক অভিভাবক এ সময় চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে ঘরে বসে ছেলে-মেয়েদের নিজেই এটা করান। উৎকণ্ঠা কোন্ পর্যায়ে গেলে এমন একটা অমানুষিক ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা না বোঝার কিছু নয়। কিন্তু এর ফলে ভর্তির একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত যেসব ভাগ্যবান ছেলে-মেয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পায়, শুরুতেই হয়ে যায় তাদের একটা বড় রকম ক্ষতি। তারা জীবনের প্রথম পাঠ এটাই গ্রহণ করে যে, তাদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তা এবং অধ্যায়ের কোন প্রয়োজন নেই, সে সব কাজ করার জন্য রয়েছেন হয় প্রাইভেট টিউটর, না হয় অভিভাবক— তাদের নিজেদের শুধু খাবারের মতো কিংবা ওষুধের মতো তৈরি করা বিদ্যা টপাটপ গলাধঃকরণ করে ফেললেই চলবে এবং পরীক্ষার সময় তাই দিতে হবে উগরে। মস্তিষ্কের কোন চর্চা তাদের করতে হবে না। বিজ্ঞানেই বলে, চর্চা ছাড়া মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটতে পারে না। তাই শিশুদের মস্তিষ্ক ছোটবেলা থেকেই তার স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী বিকশিত না হয়ে থাকবে সঙ্কুচিত হয়ে। কিন্তু বিরাজমান ভর্তি সঙ্কটের কারণে শিশুদের ক্ষতির এই দিকটি দেখার মতো কোন সুযোগ ও মন-মানসিকতা অভিভাবকদের নেই। যেনতেন প্রকারে একটা ভাল স্কুলে নিজের সন্তানকে ভর্তি করানো ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই একজন অভিভাবকের। অথচ এভাবে ভর্তি করানো শিশুটি বড় হয়ে জাতির সত্যিকার উজ্জ্বল কোন ভবিষ্যত রচনার নিশ্চয়তাই বহন করে না। ভবিষ্যতকে সুদৃঢ়, উন্নত ও নির্ভরযোগ্য করার স্বার্থে ভর্তিযুদ্ধটাকে আনতে হবে সহজ ও স্বাভাবিক খাতে।

সেজন্য প্রথমত দরকার সারা দেশে প্রাথমিকসহ সব রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গত পাঁচ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক। কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং শিক্ষক সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়েনি। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৬ হাজার ৮শ' ৩৬ জন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৪৮ লাখ ৪১ হাজার। দেশে সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫৬ হাজার ৭শ'। এখন সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী তিন বছরে আরও ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

এক হিসাব অনুযায়ী রাজধানীতে বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তিন শতাধিক এবং বেসরকারী অর্ধশতাধিক। এছাড়া আছে প্রায় ৫শ' কিন্ডারগার্টেন, যেগুলোয় আর্থিক কারণে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা ভর্তি হতে পারবে না। তাছাড়া কিন্ডারগার্টেনগুলো ভর্তির চাপ কিছুটা 'ডিফিউজ' করে দিতে সক্ষম হলেও সেগুলোর দরুন দেশে 'দুই শিক্ষা ব্যবস্থা' বহাল থাকছে বলে সেগুলোর প্রসার আমাদের কাম্য নয়।

ভর্তিযুদ্ধের মোকাবিলা সার্থকভাবে করতে হলে বিদ্যমান স্কুলগুলোয় যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে ত্বরিত আসনসংখ্যা না বাড়িয়ে, একাধিক শিফট চালু ও নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা না করে উপায় নেই। সেই সঙ্গে অবশ্যই সর্বত্র দৃষ্টি দিতে হবে শিক্ষার মান উন্নত করার ওপরে। বিকল্প পথ হিসাবে এক বছর ঘরে বসে থেকে আবারও ভর্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া কিংবা অখ্যাত কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চিন্তা শিক্ষার্থীর কাছে যেমন মনঃপুত হতে পারে না এবং তা হতোদ্যমকারী হতে বাধ্য, তেমনি অভিভাবকের কাছেও তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে না। শিক্ষার্থীকে এক বছর ঘরে বসিয়ে রাখলেই পরের বছর তার ভর্তির সুযোগ অবারিত হয়ে যাবে, এমন কোন নিশ্চয়তা কোথাও নেই। আবার অখ্যাত একটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার কারণে একজন সম্ভাবনাপূর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীর গোটা শিক্ষা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভর্তি সমস্যা মাধ্যমিক স্কুলগুলোয়ও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র কমবেশি একই রকম প্রকট। সমস্যার কারণগুলো এবং সমস্যা মোকাবিলার কায়দা-কানুনও প্রায় একই রকম।

যুদ্ধ করতে হচ্ছে সর্বত্র প্রায় একইভাবে, টিউটর রেখে, গাইড বই গুলিয়ে খাইয়ে, ধরপাকড়-তদ্বির চালিয়ে, হাজার হাজার ডোনেশনের টাকা যোগাড়ের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে। একটা অসুস্থ পরিবেশ ছেয়ে আছে ভর্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। গোটা জাতির জন্য তা অমর্যাদাকর, লজ্জাকর। আমরা এ পরিবেশের চির অবসান চাই। সর্বত্র সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠুক। ভর্তির জন্য অভিভাকদের নাকাল হওয়া বন্ধ হোক। বিরাজমান সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটি অন্তর্বর্তীকালীন পথ বের করে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল এবং সহজ পদ্ধতিতে সর্বত্র ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে। লাঘব করতে হবে বিশেষ করে সীমিত আয়ের অভিভাবকদের কষ্ট এবং দুর্ভোগ।